সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৮

এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নিউক্লিয়ার বিরোধী

রচনা আলোচনা

সংবাদ সংকলন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী ।। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ।। ষষ্ঠ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী লেখা চায়

বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞান কর্মীদের সমস্যা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের লেখা পেতে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই। রেফারেন্সে লেখকের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, প্রকাশক, প্রকাশনার স্থান ও সময়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে লেখকের নাম, ঠিকানা ও ডাক-টিকিট সহ খাম থাকা বাঞ্ছনীয়।

যোগাযোগের ঠিকানা : c/o ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজ
52/9C বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-12
(প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা : বার্ষিক পাঁচ টাকা।
স্টলের কমিশন (10 কপি বা ততোধিক) 25%
এজেন্টদের কমিশন : 33%

মানি-অর্ডারে যাঁরা টাকা পাঠাবেন, তাঁদের ফর্মের নীচে নাম ঠিকানা লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1982

বিষয় — পৃষ্ঠা

কেন এই সংখ্যা : সম্পাদকীয়— 1

পৃথিবীর নিয়তি—রবীন মজুমদার 1

যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা ও গরীব দেশ — রবীন চক্রবর্তী 4

একজন চিকিৎসকের জীবনী থেকে — হেলেন ক্যালডিকট্ 5

মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব—পর্যালোচনা 7

তেজস্ক্রিয় আবর্জনা : কারিগরী, রাজনীতি, ঝুঁকি—সত্যবান রায় 8

হিরোশিমা দিবসের নেপথ্যে—অভিজিৎ লাহিড়ী 11

হিরোশিমা স্মরণে প্রতিবাদের গণকণ্ঠ (বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ) 13

JACARI ও বোস ইনস্টিটিউট সংবাদ— 16

বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার উদ্যোগে

স্লাইড সেট : (1) জল ও আমাদের স্বাস্থ্য (2) সূর্যগ্রহণ
(3) বন্যা (4) দৈনন্দিন জীবনে বলবিদ্যা

পুস্তিকা : না হিরোশিমা নাগাসাকি চাই না (পিপল্‌স্ সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে।

স্লাইড ব্যবহারের জন্য ইচ্ছুক সংগঠন যোগাযোগ করতে পারেন—
রবীন চক্রবর্তী, অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস ডিপার্টমেণ্ট
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ, রাজাবাজার

কেন এই সংখ্যা ঃ সম্পাদকীয়

গত ছয়ই আগস্ট, কলকাতার শহীদ মিনারের নীচে আমরা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম 'হিরোশিমা দিবস' উপলক্ষ্যে। গত 1945 সালের এই দিনটিতে জাপানের হিরোসিমার বুকে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা স্মরণ করে আমাদের 'হিরোশিমা দিবস'।

ছয় থেকে নয়ই আগস্ট ঠিক ছিলো পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ধিক্কার জানানো হবে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের প্রস্তুতিকে, শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠান করা হবে হিরোসিমা-নাগাসাকির বোমার বিধ্বংসী কাণ্ড সম্পর্কে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে। মানব সমাজের ওপর চেপে বসা এই নিউক্লিয়ার বিপদকে আমরা প্রকাশ্যে খুলে ধরতে চেয়েছিলাম। অনেকগুলি বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের মিলিত প্রয়াসে, বেশ কিছু দিনের প্রস্তুতি নিয়ে 'হিরোশিমা দিবসের' অনুষ্ঠান সফল হলো।

নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন বলতে যা বোঝায়—'হিরোশিমা দি ঠিক তা' নয়। একটা দিনকে বেছে নিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের নিউক্লিয়ার আ লনের একটা পটভূমি তৈরী করতে 'হিরোশিমা দিবস' সাহায্য কর পারে।

নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনে অনেক কিছু বলার আছে। সারা বি এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। সেই নানা মতের কিছু সংগ্রহ, আর সাথে পশ্চিমবঙ্গের 'হিরোশিমা দিবস' উপলক্ষ্যে নানা খবরের সংকলন 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার এবারের সংখ্যাটি সাজানো হলো।

পত্রিকায় প্রকাশিত এই মতামতগুলিতে বিশেষ পক্ষপাত করা হয়নি পাঠকের বেছে নেওয়ার সুবিধের জন্য। আমরা চাইছি সচেতন বিতর্ক

পৃথিবীর নিয়তি

রবীন মজুমদার

পরমাণু অস্ত্র পৃথিবীকে এখন যে অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, তাকে কিছুটা তুলনা করা যায় যাত্রী বোঝাই একটি বাসের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত গভীর গিরিবর্ত্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে। তুলনাটা অবশ্য নিতান্তই স্থূল। কারণ বাসটি দুর্ঘটনায় পড়লে কিছু মানুষের মৃত্যু হবে ঠিকই, কিন্তু পরমাণু যুদ্ধে পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন।

বিগত সাঁইত্রিশ বছর ধরে একের পর এক নতুন নতুন প্রজন্মের পরমাণু অস্ত্র তৈরী হয়েছে—প্রতিটি নতুন প্রজন্ম তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীরভাবে বিধ্বংসী। দু'হাজার কোটি টন টি. এন. টি. 'র ক্ষমতাসম্পন্ন ছোটবড় প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরমাণু বোমা আজ মজুত। ষোল লক্ষ হিরোশিমা বো সমান তাদের ধ্বংস ক্ষমতা। মাঝারী ও দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র বাহিত এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে নিখুঁত লক্ষ্যে স্থির তাদের নিশা জলে ও স্থলে গোটা পৃথিবী জুড়েই তাদের অবস্থান।

পরমাণু বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা, টি. এন. টির মত সাধারণ বিস্ফোরকের পরিমাণে প্রকাশ করাটাও ভুল। কারণ, সাধারণ বিস্ফো তৈরী বোমায় যেখানে ধ্বংস ঘটে একটি মাত্র উপায়ে—বাতাসের ঘাত (bla সৃষ্টির মাধ্যমে, পরমাণু বোমা সেখানে অন্তত পাঁচটি উপায়ে প্রা ধ্বংসলীলা সংঘটিত করে।

াটা পৃথিবীই পরিণত হবে কীট ও ঘাসের রাজ্য

বিস্ফোরণের প্রাথমিক ধাপে যারা রক্ষা পাবে, তারাও শেষ পর্যন্ত নকেই রেহাই পাবে না। পরমাণু বোমার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পালিয়ে ার কোন কার্যকরী উপায় নেই। একশো কিলো টনের বেশী ক্ষমতার• রোশিমার আটগুণ) বোমার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসের উপরের র মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে আরও দূরে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। নকি সারা পৃথিবীতে। চলবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে। বিলম্বিত বিশ্বজোড়া তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবে মানুষ, গাছপালা, পশু- ী গোটা প্রাণীজগৎ। এই সার্বিক ধ্বংসকে আরও নিশ্চিত করে তুলবে থবীর আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন। পৃথিবীকে ঘিরে থাকা জান স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মি ও ক্ষতিকারক ্যান্য মহাজাগতিক রশ্মি আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। মানুষ সহ ন্ত প্রাণীর চোখে অন্ধত্ব নেমে আসতে পারে এর ফলে, চামড়ার সারে মানুষের মৃত্যু আসবে ঘনিয়ে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার ভাণ্ডারে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র জমা হয়েছে, ত তারা পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবেই ধ্বংস করতে পারে। যতদূর া যায়, শেষ পর্যন্ত হয়তো টিকে থাকবে শুধু কয়েকটি কীটপতঙ্গের াতি এবং কয়েক প্রকার ছোট ছোট ঘাস। কারণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহ্য ার ক্ষমতা এদেরই সবথেকে বেশী। কাজেই সেরকম অবস্থায় আমেরিকা গয়া সহ গোটা পৃথিবীই পরিণত হবে কীট ও ঘাসের এক রাজ্যে (A public of Insects and grass)।

ই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন

তেমন কোন সার্বিক পরমাণু যুদ্ধ যদি বিগত সাঁইত্রিশ বছর আমরা য়ে চলতে পেরে থাকি, তবে ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই পারব— কেই হয়তো এমন দুরাশায় বুক বাঁধতে চান। কিন্তু বর্তমান া মোটেই তেমন উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিযোগিতার মূল দুই ই 'পরস্পরকে বিনাশ করার নিশ্চিত ক্ষমতা' অর্জন করে ফেলেছে। অথচ মুখে বলছে—এই ভীতি থেকেই পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাকছে। তর জন্যই ধ্বংসের এই ব্যাপক প্রস্তুতি—তথাকথিত deterrance তর এই আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার সময় এখন আর । কেননা, কোন একটি মাত্র ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্ত বা পাগলামির ফলে যেমন পরমাণু যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। তেমনি, তা হতে পারে সামান্য কোন যান্ত্রিক ত্রুটির ফলেও। ভুল কোন সংকেত পেয়েও শত শত বোমা-বাহী ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক-বার সে রকম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল পৃথিবী। বিশ্বের বর্তমান রাজনীতিক আর্থনীতিক স্থিতাবস্থার এতটুকু ইতরবিশেষ ঘটার সম্মুখীন হলেই, শান্তির পূজারী শক্তিধর রাষ্ট্রনায়করা যে কেমন অশান্ত হয়ে ওঠেন এবং পরমাণু অস্ত্রের আস্ফালন শুরু হয়, তাও আজ বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। আজকের দিনে সীমিত পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনাও খুবই সীমিত। মোটকথা, পরমাণু যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করতে উন্মুখ; আজ না হ'লে কাল তা হতেই পারে, এ বছর না হ'লে পরের বছর।

সুতরাং সৌরজগতে প্রাণের একমাত্র আধার এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তি-ত্বই আজ বিপন্ন।

একক মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়েও বংশপরাম্পরায় চলে জীবনের প্রবাহ। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু জীবনেরই ধর্ম। কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উত্তরণ তাতে ব্যাহত হয় না। প্রজন্ম পরম্পরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রগতির গ্রহনে এমনি করেই গড়ে উঠেছে ইতিহাস, ঘটে চলেছে ক্রমবিকাশ। মানবজাতির সার্বিক বিনাশ (extinction) তাই ব্যক্তি মানু-ষের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেটা হবে পরম্পরার মৃত্যু, জীবনপ্রবাহের থেমে যাওয়া, সময়ের গতি রুদ্ধ হওয়া। অনাগত প্রজন্মের পথ রোধ করার সামিল। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, কোন দেশ বা এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের পিতামাতা হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের সব মানুষেরও কি এই অধিকার আছে? থাকা উচিত? ..... মানবজাতি আজ এই দ্বিতীয় মৃত্যুর (Second Death) মুখোমুখি।

এই অপ্রাকৃতিক, বীভৎস, অশ্লীল, প্রতিজৈবনিক বাস্তবতা, এই ভয়াবহ অনিশ্চিয়তা আমরা অবিশ্বাস করতে চাই। ঘৃণায় ভুলতে চাই। কিন্তু চোখ বুজে অন্ধ সাজলেই কি 'প্রলয় বন্ধ হয়'? যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তির সম্ভাবনা আমাদের মানবিক মূল্যবোধ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি যাবতীয় প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাতে উদ্যত। শিল্প-সংস্কৃতি, বিজ্ঞানেও তাই বলি হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা।

অতএব আর দেরী নয়, কাজ শুরু করতে হবে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে। আমরা নিজেরাই এ অবস্থা সৃষ্টি করেছি আমাদেরই তা রদ করতে হবে। আমাদের অধিকারে দুটো পৃথিবী নেই যে একটিকে আমরা ধ্বংসের পরী-ক্ষায় উৎসর্গ করবো। ধ্বংস এড়াবার জন্যই বিনাশের এই প্রস্তুতি—এহেন

স্ববিরোধী যুক্তির জালে আর কতকাল আটকে থাকব আমরা? গিরিখাতে বাস বিচূর্ণ হবার আগেই সর্বাগ্রে দেখতে হবে চালক ব্রেক প্রয়োগ করছে কি না। প্রাথমিক প্রয়োজন, সমস্ত পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস বা অকেজো করে ফেলা। অতঃপর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, এই ধ্বংসের গোলক ধাঁধা থেকে চিরতরে মুক্তির পথ।

ভুলে গেলে চলবে না যে, বর্তমান অবস্থার উৎস নিহিত আছে আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎকর্ষতার মধ্যে। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির অস্তিত্ব ও তার মুক্তির প্রাকৃতিক নিয়ম যদি আমাদের অধিগত হয়ে থাকে, তবে তাকে অনধিগত করা আমাদের সাধ্যাতীত। কাজেই যদি এখন সমস্ত পরমাণু অস্ত্র নষ্টও করে ফেলা হয়, তবু কোন না কোন দেশের পক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে পুনঃপ্রয়োগ করে আবার পরমাণু অস্ত্র তৈরী করা খুবই সম্ভব।

আর সব কিছুর সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র যুদ্ধকেও ধ্বংস করবে

বাস্তবে পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড বহু দেশে বিভক্ত হলেও, পরমাণু অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতার মুখে এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, প্রাণের একক আধার। এই বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে, আমাদের মুক্তিপথের ইঙ্গিত। স্বাধীন সার্বভৌম বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় মাঝে মাঝে তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া—এই দুটো ব্যাপার ঐতিহাসিকভাবে আমাদের মনে গেঁথে গেছে, যেন এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু আমাদেরই সৃষ্ট এই ব্যবস্থার প্রয়োজন বহুদিন ফুরিয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে, আইনস্টাইনীয় যুগে বাস করে, রাজনীতিক দিক থেকে বলতে গেলে, আমরা নিউটনীয় যুগেই পড়ে আছি। সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার দোহাই পেড়েই নেতারা, গোটা মানব জাতিকে বাজি ধরে বসে আছে। অথচ কোন একটি বিশেষ দেশের বা মানবগোষ্ঠীর স্বার্থ, গোটা মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে বড় হতে পারে না। যেহেতু পরমাণু যুদ্ধ জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে যুদ্ধের চিরাচরিত যে উদ্দেশ্য—কোন দেশের স্বার্থসিদ্ধি করা—তা পূরণ করতে পারবে না, সেজন্য পরমাণু অস্ত্রে কোন 'যুদ্ধ' আজ অবাস্তব। আর সব কিছুর সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র যুদ্ধকেও ধ্বংস করবে।

কাজেই শুধুমাত্র পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে 'যুদ্ধ' টিকিয়ে রাখলে, অন্যান্য প্রচলিত অস্ত্রে বিভিন্ন দেশের শক্তির বিভিন্নতা, দুর্বল দেশকে পুনরায় পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে প্রলুব্ধ করবে।

অতএব, পরমাণু অস্ত্র অচল করে আমাদের এগোতে হবে সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে। আর সেই সঙ্গে এক বিশ্ব রাজনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারবে যুদ্ধকে বাদ দিয়েই। এই কেন্দ্রীভূত রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্ভব না করে তুলতে পারলে বিশ্বশান্তির আশা দুরাশাই থেকে যাবে। জীব প্রজাতি হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের জন্য যদি আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবে সেগুলিকে আঁকড়ে না থাকাটাই হবে মানবোচিত।

যদি পরমাণু অস্ত্রের প্রকৃত বিপদ আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যদি প্রাণের একক আধার এই পৃথিবীর জন্য আমাদের মমতা থাকে, তবে আমরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আত্মীয়জ্ঞান পারবো। পারবো আপাতদৃষ্টিতে ইউটোপীয় সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পেঁছিতে এবং নতুন বিশ্বরাজনীতিক ব্যবস্থায় উন্নীত হতে।

উপরে যে আলোচনা করা হল তা জোনাথান শেলের 'পৃথিবীর নিয়তি' শীর্ষক গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

'A Republic of Insect and Grass',
'The Second Death' এবং
'The Choice'

এখানে যথা সম্ভব আলাদাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে শিরোনামের তিনটি অংশকেই। আলোচ্য সংস্করণের প্রচ্ছদজোড়া গভীর কালো রং যদি পৃথিবীর নিয়তির ইঙ্গিতবাহী হয়, তবে সাদা অক্ষরে বইয়ের ও লেখকের নামের মতই বইটি পৃথিবীর বর্তমান সংকটে একটি আলোর রেখা। বই-এর বক্তব্যের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একমত সকলে নাও হতে পারেন, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব ।।

[The Fate of the Earth—Jonathan Schell, Pan Books Ltd. (PICADOR), 1982, পৃষ্ঠা সংখ্যা—244, মূল্য—£ 1·95 (প্রায় 35 টাকা)]।

যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা ও গরীব দেশ

অস্ত্র ব্যবসার জোয়ার চলছে দুনিয়া জুড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে য দেশ যত উন্নত, এই কারবারে হিস্যা তার তত বেশী। এই বেহিসাবী বলেল্লাপনার বোঝা বইছে পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষজন। ন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। নমুনা হিসেবে দত্ত হল নীচের হিসাব ঃ

1979-80 সালে তৃতীয় বিশ্বে চালানী অস্ত্রসস্ত্রের ভাগা বাঁটোয়ারা

কনেছে যারা	মোট অস্ত্রের শতকরা ভাগ
ধ্য ও পশ্চিম এশিয়া	48.0%
র্ব এশিয়া	17.0%
ত্তর আফ্রিকা	9.2%
শ্চিম আফ্রিকা	9.0%
ক্ষণ আমেরিকা	9.0%
ারতীয় উপমহাদেশ	6.4%
ধ্য আমেরিকা	1.4%

বেচেছে যারা	মোট অস্ত্রের শতকরা ভাগ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	45.0%
সোভিয়েত রাশিয়া	27.5%
ফ্রান্স	10.0%
বৃটেন	5.0%
ইটালী	3.0%
পশ্চিম জার্মানী	2.3%
অন্যান্য	4.2%
তৃতীয় বিশ্বের দেশ	3.0%

ত্র ঃ ষ্টকহোম ইন্টারন্যাশানাল পীস্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট রিপোর্ট 1981

এই কেনাবেচার ফর্দ্দে হরেক সামগ্রী আছে। যেমন, ট্যাংক, বিমান, ামা, বন্দুক, জাহাজ, ক্ষেপনাস্ত্র, সাবমেরিণ থেকে আরম্ভ করে জীপ, ক, বেতার যন্ত্র, কম্পিউটার, পোষাক পরিচ্ছদ সবই আছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-দ্ধের কাল থেকে আজ পর্যন্ত এ সমস্ত অস্ত্রসস্ত্রের গুণগত মান যেমন ন্নত হয়েছে, দামও বেড়েছে বহুগুণ।

একটি নমুনা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের একটি যুদ্ধ ট্যাংকের দাম ছিল লক্ষ টাকার মত। আজ সর্বাধুনিক একটি ট্যাংকের মূল্য দাঁড়িয়েছে দেড় কোটি টাকা—বৃদ্ধি 30 গুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মত উন্নত দেশে 1972 থেকে 1977 এই পাঁচ বছরে সামরিক খাতে মাথাপিছু ব্যয় বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 25% এবং 40%—সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশে এই বৃদ্ধির হার 100% এর বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে এর মান 400% এর মতো—যেমন আফ্রিকার কেনিয়াতে। এইভাবে উন্নত দেশগুলির উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে গড়ে ওঠা বিকৃত উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্ত জঞ্জালের বোঝা জমা হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র অঞ্চলের মানুষজনের কাঁধে।

এখন প্রশ্ন, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যাদের, সেই সমস্ত দেশ কিভাবে মেটায় এই দায় —উত্তর খুব সোজা। মেটায় পেটে গামছা বেঁধে—আরো কষে বেঁধে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটাতে রপ্তানী বাড়ায়। যে রপ্তানীর তালিকায় থাকে দেশের মানুষের মুখের গ্রাস। রক্তমূল্যে উৎপাদিত খাদ্যশস্য বা খনিজ পদার্থ। উদ্বৃত্ত বলে রপ্তানী—মোটেই তা নয়।

একটি নমুনা ঃ আফ্রিকার একটি রাষ্ট্র – মালি। যেখানে 1767 সালে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ছিল 60 হাজার টন। এতে দেশের চাহিদা মোটেই পুরত না। সেই উৎপাদন কমে 1977 সালে দাঁড়িয়েছে 15 হাজার টন। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার খাঁকতি মেটাতে আজ বেশীর ভাগ জমিতেই হচ্ছে তুলো ও বাদামের চাষ। দেশে মানুষ তবে খাবে কি ? বিদেশী মুদ্রা ?

এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—মূল্যবৃদ্ধি। স্বচ্ছল মানুষেরা যে কোন মূল্যে কিনে নেয় তাদের অংশটুকু।

বোঝার উপর শাকের আঁটি – খনিজ তৈল উৎপাদক দেশগুলি এই বায়ভার মেটায় তেলের দাম বাড়িয়ে। নতুন ধাঁচের শিল্প ও অর্থনীতিতে তেল অপরিহার্য। যে কোন মূল্যে সংগ্রহ করতে হয় সেই তেল সব দেশকেই। পরিণতি একটাই—আবার মূল্য বৃদ্ধি।

এখানেই শেষ নয় এই অংক। আর্থনীতিক চাপ যত বাড়ে মানুষের অসন্তোষ তত বাড়ে—বাড়ে বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন। সেই গণ বিক্ষোভ রুখতে ব্যবহৃত হয়, পুলিশ মিলিটারী অস্ত্র। সরকার নিরাপত্তার অভাব বোধে খোঁজেন আরো অস্ত্র। চাই আরো অস্ত্র, আরো সামরিকীকরণ —চলে

শোষণ, বিক্ষোভ, নির্যাতন—চক্রাকার পথে।

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকৃত প্রয়োগ স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে যত মানুষের জীবনে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী মানুষের বেঁচে থাকার শে সম্বলটুকু নিচ্ছে কেড়ে।

সূত্র : Bombs for Breakfast —Committee on Poverty and Arms Trade (COPAT); London, 2nd Edn. 1981

রবীন চক্রবর্তী

একজন চিকিৎসকের জীবনী থেকে

হেলেন্ ক্যালডিকট্

[হেলেন্ ক্যাল্ডিকট্ হলেন একজন মহিলা চিকিৎসক। জন্ম অষ্ট্রেলিয়ায়। গত প্রায় এক দশক ধরে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে সচেতন করে আসছেন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সমস্যাটি ইনি একজন চিকিৎসক ও শারীরতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। পরমাণু বিরোধী আন্দোলনে ইনি নানাভাবে যুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বায়ুমণ্ডলে ফ্রান্সের পরমাণু বোমার পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করতে হেলেন ক্যাল্ডিকটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম খনির শ্রমিকরা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এঁরই মাধ্যমে।

তাঁর লেখা বই Nuclear Madness : What you can do' দুনিয়া জুড়ে প্রশংসিত।

হেলেন্ ক্যাল্ডিকট্ লিখিত নীচের লেখাটি Campaign Against Nuclear Energy প্রচারিত একটি প্রচারপত্র থেকে সংগৃহীত। বাংলায় অনুবাদ করেছেন রবীন চক্রবর্তী।]

1972 সাল থেকে ফ্রান্স প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বায়ুমণ্ডলে যত-বার পরীক্ষামূলক পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ততবারই অষ্ট্রেলিয়ার টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আমায় ডেকেছেন, শিশুদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে। এর কারণ, প্রতিবারই ওই পরীক্ষার শেষে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল। অবশেষ অষ্ট্রেলীয় জনমত এর বিরুদ্ধে এত মুখর হয়ে ওঠে যে, সরকার বাধ্য হয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিশ্ব আদালতে মামলা করতে। মামলার রায়ে ফরাসী সরকার বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে ওরা ভূগর্ভে এই পরীক্ষা চালায়। ধরতে পারি এটি আমাদের আংশিক জয়।

ইউরেনিয়ামের ব্যবহার

আমি জানতাম তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের দুরকমের ব্যবহার—এক, পরমাণু বোমার মশলা হিসাবে; দুই, পরমাণু চুল্লীর জ্বালানী হিসেবে সেই থেকে এ বিষয়ে যতই পড়াশুনা করছিলাম, একজন চিকিৎসক হিসে মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। পরমাণু চুল্লী তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সংরক্ষণের কোন নিরাপদ ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি অন্যদিকে এই পরমাণু চুল্লী থেকেই মেলে প্লুটোনিয়াম-239—পরমা বোমার আদর্শ মশলা।

এর পর থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেত করতে প্রচার অভিযানে নামলাম। অষ্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম খনি শ্রমি সংগঠনের কাছে কিছু বলতে চেয়ে যখন চিঠি লিখি, তারা আমন্ত্রণ জানালে লিখল— এতে খুব একটা কাজ কিছু হবে না—কারণ এর সাথে জড়িত তাদে রুজিরোজগারের প্রশ্ন। কিন্তু সেখানে গিয়ে মিনিট দশেক বলতেই দে

লর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সকলে দুঃস্বরে বলে ওঠে–'হায় ান, এই আমাদের ভবিষ্যৎ !'

এরপর প্রচার মাধ্যমগুলি কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিস্ময়ের লক্ষ্য করি –এ ব্যাপারে ওদের মোটেই কোন মাথা ব্যথা নেই। তখন- মত অবাক না হয়ে পারিনি। পরে অবশ্য আবিষ্কার করি এর কারণ। এরাই ইউরেনিয়াম খনির বড় বড় শেয়ারের মালিক।

জস্ক্রিয় বিকিরণ

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষই তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয় বেশী। স্ক্রিয় বিকিরণে দেহের কোষ ও জিনের বিকৃতি ঘটে, নানান রোগের লক্ষণ শ পায়। যার মধ্যে আছে ক্যানসার, আছে লিউকোমিয়া। এই সমস্ত খ আবার বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

পরমাণু বিভাজনের ফলে বহু তেজস্ক্রিয় মৌলের সৃষ্টি হয়, যা দের চার পাশের গাছগাছালি ও প্রাণীদেহে আশ্রয় নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন চক্রের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণ কিংবা পরমাণু চুল্লী সূত্র থেকেই এগুলি জন্ম নেয়। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাণী- সংগঠনে যে সমস্ত মৌলের প্রয়োজন, তার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি- াকে এর মধ্যে, যেমন কার্বন—14, আয়োডিন—131, ষ্ট্রনশিয়াম—90, াল্ট—60 ইত্যাদি। এগুলি খুব সহজেই জায়গা করে নেয় দেহের বিশেষ ষ স্থানে।

যেমন শিশু যে দুধ পান করছে তাতে যদি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-131 , তাহলে ওই আয়োডিন তার থায়রয়েড গ্রন্থিতে আশ্রয় নেবে এবং একদিন য়েড গ্রন্থির ক্যানসার সৃষ্টি করবে। সেই দুধে যদি থাকে ষ্ট্রনশিয়াম- তাহলে ক্যালসিয়ামের পরিবর্ত হিসাবে খুব সহজেই জায়গা পাবে দেহের ও মজ্জায়। বছরখানেক বাদে, এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে লিউকোমিয়া ার আকারে।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্লুটোনিয়াম-239 প্রকৃতিতে ছিল না। মানুষই স্থান করে দিয়েছে প্রকৃতিতে। মাত্র দশপাউণ্ড প্লুটোনিয়াম-239 এ হতে পারে একটি বিধ্বংসী পরমাণু বোমা। আবার এর এক গ্রামের লক্ষ ভাগের এক ভাগেই মানুষের দেহে দেখা দিতে পারে ফুসফুস, র কিংবা হাড়ের ক্যানসার। আমি যদি ফুসফুসের ক্যানসারে মারা তো সেখানেই শেষ নয়। আমার মৃতদেহ সৎকারের পর ওই বিষ সে মিশে জায়গা নেবে আর একজনের ফুসফুসে।

2020 সালের মধ্যে একা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই জমা হবে 30 হাজার টন প্লুটোনিয়াম। কিন্তু ওরা এখনও জানেনা, কি করবে এই বিপুল পরিমান তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে। তবে প্রতিনিয়তই বলে চলেছে—'বিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন—পন্থা একটা বার করবই আমরা।' এটা যেন ক্যানসার রোগে আক্রান্ত কোন রোগীকে এই বলে আশ্বস্ত করা যে—'দেখুন আপনি আর সম্ভবতঃ মাস ছয়েক বাঁচবেন। কিন্তু একজন সৎ চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আর বছর কুড়ির মধ্যেই এর প্রতিকার কিছু একটা বার করবই।'

পারমানবিক অস্ত্র

যে কোন রাষ্ট্রই যদি একটি পরমাণু চুল্লী জোগাড় করতে পারে, তবে চেষ্টা করলে সে একদিন পরমাণু বোমা তৈরী করতেই পারে। যেমন ভারত কানাডার কাছ থেকে একটি পরীক্ষামূলক পরমাণু চুল্লী কিনেছিল—ভারত পরমাণু বোমা বানিয়েছে। এখন পাকিস্তান ওই চুল্লী বসাচ্ছে—সেও বানাবে ওই বোমা।

যত বেশী বেশী দেশ পরমাণু চুল্লী বসাচ্ছে, তত ছোট ছোট আকারে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ছে। একবার যুদ্ধ বাঁধলে, বৃহৎ শক্তিদেরও জড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হবে না।

বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কম করে 2 টন ওজনের মত তেজস্ক্রিয় পদার্থ চুরি গেছে বা খোয়া গেছে। নিশ্চয়ই কেউ কেউ জোগাড় করেছে সেগুলি। আর ওই পরিমান মশলা দিয়ে বেশ কয়েক'শ বোমা তৈরী হতে পারে। কথিত আছে, ইস্রায়েলের কাছে মজুত আছে যে পরমাণু বোমা, তার মশলা এভাবেই সংগৃহীত। যদি ইস্রায়েল চুরি করে যোগাড় করতে পারে এই মশলা, তবে পি, এল, ও-ই বা পারবে না কেন, অথবা আই, আর, এ, বা ইরানের বিপ্লবী সংগঠনই বা পারবে না কেন ? অর্থাৎ যে কেউই পারে তা সংগ্রহ করতে এবং পারে এই বিধ্বংসী অস্ত্রের অধিকারী হতে।

একদিকে এমন অপচয়, অন্যদিকের চিত্র কেমন ? বিশ্বের দুই- তৃতীয়াংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। বেশীর ভাগ মানুষের ধারে কাছে নেই কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। রোগী দেখে ওষুধ লিখে দিলে পর, মরণাপন্ন রুগীর অভিভাবকদেরও অসহায় ভাবে বলতে শুনেছি ওষুধ কেনার সামান্য সামর্থও নেই তাদের।

এতদিন আমাদের দেশ অষ্ট্রেলিয়ার সামরিক ব্যয় তত ছিল না।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

কিন্তু ক্রমেই হাওয়া বদলাচ্ছে। মনে হচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত এরাও একদিন নাগরিকদের কাছ থেকে উন্নয়নের নামে আদায় করা ট্যাক্সের অর্দ্ধেক-টাই চাইবে সামরিক খাতে ব্যয় করতে।

কিন্তু কিভাবে সম্ভব হচ্ছে এটা? মনে হয় ওই লোকগুলি কোন-দিন দেখেনি হাসপাতালের নির্জন কক্ষে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশুর তিলে তিলে মৃত্যু। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলে সীমিত যুদ্ধের কথা। বলে তেমন যুদ্ধে কোটি দু'য়েক আমেরিকাবাসী মরতে পারে। ভাবখানা যেন—এ আর তেমন কি ব্যাপার! তবে কর্তব্য হিসেবে নাগরিকদের শেখাচ্ছেন আত্মরক্ষার পদ্ধতি। এভাবে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লাভ কি? সুরক্ষিত আশ্রয় শিবিরে প্রথমত কতজন আর জায়গা পাবে? আর পেলেও কি সব বিপদ এড়ানো গেল? শিবির থেকে বেরিয়েই যে প্রতিকূল পরিবেশে পড়বে সকলে, তা থেকে পরিত্রাণ পাবে ক'জন? দেখবে কোন খাদ্য নেই, জল নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, নিঃশ্বাস নেওয়ার মত বিশুদ্ধ বাতাসও নেই। এমন পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়তে সময় লাগবে না বেশী। এর পর মৃত্যু শুধু সময়ের ব্যাপার।

আমাদের অজ্ঞতা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক গড়ে অন্তত তিনটি পরমাণু বোমা বানায়। ওদের দেশের বেশীরভাগ কাজকারবারই যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন না কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত—যেমনটি রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়াতেও। কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবীটা তো আমাদেরও, যেমন ওই যুদ্ধবাজ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের। তবে কেন আমরা এই পৃথিবীটাকে আমাদের বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করব না?

আজ বলতেই হচ্ছে বিজ্ঞানের দুর্বার জয়যাত্রায় মানুষ আর তার সাথী নেই—সে পিছিয়ে পড়ে আছে অনেক দূরে। বিজ্ঞানীরা মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেন নি। যার ফলে অজ্ঞতা আজ সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত। আর অজ্ঞ মানুষদের ধোঁকা দেওয়া অতি সহজ। এ অবস্থা রুখতে এখনই এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। শিক্ষিত হতে হবে নিজেকে—অন্যকেও করতে হবে শিক্ষিত। এজন্য পথে নামতে হবে—জড়ো করতে হবে বিশাল বিপুল সংখ্যক মানুষ। মিছিলের সাথী হবে আমাদের শিশুরাও—যাদের গলায় ঝোলানো থাকবে আবেদন, "আমি লিউকোমিয়ায় মরতে চাই না—চাই না পরমাণু যুদ্ধের শিকার হতে।"

লাখো লাখো মানুষের পদধ্বনিতে সম্বিত ফিরলেও ফিরতে পারে ওই উন্মাদ শাসকদের। একবার অন্তত ভাবলেও ভাবতে পারে আমাদের কথা। বিশেষকরে যদি একবার মনে পড়ে, গদিতে ফিরে আসতে তো চাই এদেরই ভোট।

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকে বাঁচাতে
আমাদের একসাথে লড়তে হবে
—এবং এখনই ॥

॥ লাখো লাখো মানুষের পদধ্বনিতে সম্বিত ফিরলেও ফিরতে পারে ওই উন্মাদ শাসকদের। বিশেষ করে, যদি একবার মনে পড়ে, গদিতে ফিরে আসতে তো চাই আমাদেরই ভোট ॥

মানব দেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

মানবদেহে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব বিকিরণের মাত্রা এবং স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এই বিকিরণের মাত্রা স্থানভেদে 10 হাজার র‍্যাড থেকে কয়েক র‍্যাড অবধি হতে পারে। পরমাণু চুল্লীর চত্বরে স্বাভাবিক অবস্থায় বিকিরণের মাত্রা অল্প হলেও, দুর্ঘটনার ফলে এই মাত্রা হাজার র‍্যাডের ওপর অবধি হওয়া অসম্ভব নয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানতঃ তিন ধরণের দৈহিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাঝারি মাত্রা থেকে খুব বেশী মাত্রার বিকিরণে, যথাক্রমে দেহে রক্ত কণিকার অভাব হয়,

দ্রান্তে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং স্নায়বিক বিকার ঘটে।

দেহস্থিত হাড়ের ফাঁকগুলি ভরাট থাকে মজ্জা দিয়ে। এই মজ্জাই কণিকা উৎপাদনের উৎস। এই মজ্জা আক্রান্ত হয় 150 র‍্যাডের অধিক কিরণে। রক্তে শ্বেতকণিকা, লোহিত কণিকা এবং প্লেটলেটের ঘাটতি ড়তে থাকে। ফলে দেহ রোগ জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ক্সিজেন সংবহন ব্যাহত হয় এবং রক্ত ক্ষরণ রোধের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। থমিক অবস্থায় বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয় ঝিমুনি ও বমি বমি ভাব। ন কয়েক এভাবে কাটানোর শেষে নানা ধরণের রোগের আক্রমণ হতে রে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জ্বর, মুখে ঘা, এবং দেহের ত্বক ভেদ করে ক্ষরণ হতে থাকে। মাথার চুল ঝরে পড়তে থাকে 300 র‍্যাড মাত্রায়। গাহ চারেকের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। তবে তখনকার মত বেঁচে যাওয়ার ভাবনাও আছে।

মাঝারি পরিমাণ অর্থাৎ 400 র‍্যাডের ওপর বিকিরণে ক্ষুদ্রান্তের গায়ের াষন্তর আক্রান্ত হয়। অচিরেই পূর্বোল্লিখিত কারণে প্রতিরোধহীন অব- র রোগজীবাণুর আক্রমণে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় লরা রোগাক্রমণের অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত পেটখারাপের ল দেহে জলের ঘাটতি হয়। প্রথম দু'দিন প্রচণ্ড অস্বস্তি ও বমি হয়। তীয় সপ্তাহে জ্বর ও প্রচণ্ড রক্ত পায়খানা হতে থাকে এবং সপ্তাহ তিনেকের ধ্য মৃত্যু হয়। শতকরা পঞ্চাশভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবান তরুন ও যুবকেরা চে যেতেও পারে। তবে পরবর্তীকালে অসুস্থতা ও রোগাক্রমণের ভয় কেই যায়।

হাজার র‍্যাডের ওপর বিকিরণে স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হয়। ফলে ঝিমুনি লাগে এবং দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর দৈহিক খিঁচুনি ও অচেতন অবস্থার মধ্যে দিন তিনেকের মধ্যে মৃত্যু হয়। হাজার দশেক র‍্যাডের বিকি- রণে মৃত্যু অবধারিত এবং সময় লাগে ঘণ্টা খানেক মাত্র।

এই হ'ল তাৎক্ষণিক বিকিরণের ফল। এরপর আছে পরবর্তী পর্যায়— যার নাম "ফল আউট" (fall out)। ওপর থেকে পড়া ভস্মরাশির সাথে থাকে তেজস্ক্রিয় কণা ও দীর্ঘকালস্থায়ী মারাত্মক তেজস্ক্রিয় মৌল। প্রাথমিক বিকিরণ ও ফল আউটের সম্মিলিত প্রভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন পাঁচ-ছ বছরের মাথায় লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে— পনের কুড়ি বছরের মাথায় টিউমার ও ক্যানসারে। মোটামুটি হিসাবে প্রতি র‍্যাড বিকিরণের প্রভাবে হাজারে এক জনের এই রোগাক্রমনের সম্ভাবনা থাকে। যার অর্থ যুদ্ধকালীন অবস্থায় 24 ঘণ্টায় 150 র‍্যাড বিকিরণ প্রাপ্ত হলে, প্রতি 70 জনে একজনের পরবর্তী কালে টিউমার বা ক্যানসারে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হ'ল, জীব- কোষের জিন বিকৃতি। এর ফলে নানাবিধ জন্মগত ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে যা এক পুরুষেই নয়—বংশানুক্রমে চলে। সন্তান সম্ভবা মায়েদের ক্ষেত্রে বিকিরণের প্রভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রায় 45 শতাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক শিশুর (microcephaly) জন্ম হতে দেখা গেছে, যাদের মধ্যে অন্তত 14 শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী।

সূত্র ঃ The Medical Consequences of Nuclear Weapons by the groups Medical Campaign Against Nuclear Weapons (MCANW) and Medical Association for the Prevention of War (MAPW) ; Cambridge CBI 2DG ; October 1981.

তেজস্ক্রিয় আবর্জনা—কারিগরী, রাজনীতি, ঝুঁকি

সত্যবান রায়

[সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত আর, ডি লিপস্যুজের Radioactive Waste : Politics, Technology and Risk বইখানি "ইউনিয়ন অব্ কনসার্নড্ সায়েনটিস্টস্" (U. C. S.) সংস্থার একটি

কালোপযোগী প্রতিবেদন। কেম্ব্রিজ (ম্যাসাচুসেট্স্) কেন্দ্রিক এই অব্যবসায়িক সংস্থাটির সভ্যবৃন্দের মধ্যে আছেন বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য পেশার মানুষ, যারা সকলেই সমাজের ওপর আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন। দূরপাল্লার অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতা, বাতাস ও জল দূষণ, অপরিমিতহারে কীটনাশকের ব্যবহার, তরলীকৃত সাধারণ গ্যাসের সঞ্চয় ও পরিবহনের বিপদ, পারমাণবিক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা, তেজস্ক্রিয় আবর্জনার স্থানান্তরের উপায় ও সমস্যাবলী এবং শক্তি-সমস্যা সংক্রান্ত বহু বিস্তৃত পরিসরের বিতর্কমূলক প্রশ্নাবলী নিয়ে U. C. S. নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক গবেষণা করেছেন ও করছেন। তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সমস্যা আজ পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহারকারী সমস্ত দেশেরই সমস্যা। তাই যদিও প্রতিবেদক এই বইটি মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক রাজনীতিক-কারিগরীর প্রেক্ষাপটে রচিত, তবু ভারতবর্ষ তথা অন্যান্য দেশের সমাজ ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহী মানুষের কাছে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে।]

নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শৃংখল বিক্রিয়ার তত্ত্বকে রূপ দেওয়া হয়েছে পারমাণবিক চুল্লীর নির্মাণে। এর উপযোগিতা মুখ্যত তিনটি—পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরমাণু অস্ত্রের উপাদান প্লুটোনিয়াম-239-এর উৎপাদন আর বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন। যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হোক না কেন, শক্তি উৎপাদনের পরে যে তেজস্ক্রিয় অবশেষ পড়ে থাকে, ভাবনার শুরু সেখান থেকেই। কি করে সেই তেজস্ক্রিয় আবর্জনাকে জীব পরিবেশের সংস্পর্শ মুক্ত জায়গায় স্থানান্তর করা যায়, সে' চিন্তাতেও জড়িত রয়েছে একটা বিশাল প্রযুক্তি, সাতমহলা-র রাজনীতি এবং অনিশ্চয়তার ঝুঁকি।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনা শুধু যে পারমাণবিক চুল্লীর বিক্রিয়ার শেষেই সৃষ্টি হয় তা নয়। খনি থেকে ইউরেনিয়াম আকরিকের উত্তোলন, পর্যায়ক্রমে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইডের প্রস্তুতি, উপাদানে ইউরেনিয়াম-235 এর শতকরা মাত্রার বৃদ্ধি, জ্বালানী দণ্ডের প্রস্তুতি, এই সমস্ত প্রাক-চুল্লী বিক্রিয়ার মধ্যপর্বগুলিতে তেজস্ক্রিয় আবর্জনার উৎপত্তি হয়। এছাড়াও ব্যবহৃত জ্বালানীর পুনঃসংশ্লেষ, ব্যবহৃত জ্বালানীর সঞ্চয়, চুল্লীর Shut-tdown প্রভৃতি চুল্লী-পরবর্তী পর্ব তো রয়েছেই।

অপ্রিয় প্রাকৃতিক সত্য এই যে এই তেজস্ক্রিয় অবশেষ যত সহজে সৃষ্টি করা যায়, তত সহজে জীব পরিধির নাগালমুক্ত করা যায় না।

আরো অপ্রিয় ব্যবসায়িক সত্য এই যে, পরমাণু চুল্লীর উদ্ভাবনায় যে প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক মেধার স্বীকৃতি এবং ব্যবসায়িক লাভের প্রশ্ন আছে, আবর্জনার সার্থক স্থানান্তরের পদ্ধতির উদ্ভাবনায় তা নেই। তেজস্ক্রিয় অবশেষের সঞ্চয় ও স্থানান্তরের বহু বিতর্কিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চয়, ভূগর্ভস্থ স্থানান্তর, মহাকাশ-স্থানান্তর, তুষার-স্থানান্তর এবং নিউক্লিয় পরিবর্তনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তার প্রশমন। সঞ্চালিত জল বা বাতাসের শীতকের মধ্যে বাক্স-বন্দী আবর্জনার সঞ্চয়ের পদ্ধতিগুলি কোন স্থায়ী নিরাপদ ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্থানান্তরের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি ভূগর্ভস্থ স্থানান্তর। অন্যান্য আপাতাত্ত্বিক বিচারে, এই পদ্ধতির যথার্থতা আছে। তাত্ত্বিক বিচারে 15 ফুট ভূ-গর্ভের খনিজ লবণের মধ্যে তেজস্ক্রিয় অবশেষকে ভূ-পৃষ্ঠের জ সংস্পর্শ মুক্ত রেখে অথবা ভূকম্পনের প্রভাব মুক্ত রেখে লক্ষ লক্ষ বছর র যেতে পারে। তবে তত্ত্বকে কার্যে রূপান্তরের প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণায় অনিশ্চিতির আবির্ভাব এই পদ্ধতিতে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। ভূ-তা বহু বিষয় সম্বন্ধে পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞান এখনো আমরা লাভ করিনি। সংশয় ব্যক্ত হয়েছে খোদ আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি সচিবালয়ের জুলাই 1978 এর রিপোর্টে। প্রচণ্ড আশাবাদী হলে এইট বলা যায় যে এ সম্বন্ধে বহুদিন ব্যাপক আকারে স্বাধীন গবেষণা হ আমরা হয়ত একদিন একটা উপায় পাব। কিন্তু আজকের আবর্জনা কোথায় রাখি? তেজস্ক্রিয় অবশেষকে মহাকাশ-যানে চাপিয়ে সৌর-ক স্থাপন করার পদ্ধতিও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বেশ নিরাপদ। কিন্তু তার খরচে যা বহর, আমেরিকার শক্তি-মন্ত্রকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাতে ঢাকের দা মনসা বিকিয়ে যাবে। সস্তায় বিদ্যুৎ-এর কল্পনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক রসিকত

তেজস্ক্রিয় অবশেষ সহজে জীব পরিধির নাগালমুক্ত করা যায় না

তাছাড়া প্রযুক্তিগত বহু প্রশ্ন এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যার সমাধ আজো হয়নি। শক্তি-মন্ত্রকের 1979-র রিপোর্ট অনুযায়ী, এই পদ্ধতি 600 মহাকাশযান প্রত্যেক বছরে প্রয়োজন হবে। যেগুলি উৎক্ষেপনের জ যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, তা রি-অ্যাক্টরের প্রাপ্ত শক্তির এক চতুর্থাংশ এছাড়া ক্রমাগত রকেট প্রক্ষেপনে ওজোন স্তরের ভেঙ্গে যাওয়ার বিপদও আছে আর পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে যদি তেজস্ক্রিয়তা-বাহী মহাকাশযান

ন ওভাবে বিকল বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে আকাশ থেকে তেজস্ক্রিয় ইউরে-য়াম, প্লুটোনিয়াম, স্ট্রনসিয়াম আয়োডিনের, বৃষ্টিপাত পৃথিবীকে গ্রহণ তে হবে। মেরু প্রদেশের বরফের স্তরে তেজস্ক্রিয় অবশেষের স্থায়ী নান্তরের প্রস্তাব একদা দিয়েছিলেন জার্মানীর বর্ণার্ড ফিলবার্থ 1958 লে। বহুদিন পরে 1973 সালে আমেরিকায় কিছু বৈজ্ঞানিক সেই প্রস্তাবকে নর্বিবেচনার কথা বললেন। যে অসুবিধা খনি গর্ভের লবণে ছিল, বরফে তা ই। বরফের পুনঃশিলীভবন এবং নমনীয় ধর্মের (recrystallization & plastic flow), ফাটল ধরলে আবার আপনা-আপনি জোড়া গে। জলকে চুঁইয়ে ভেতরে আসতে দেয় না। উত্তপ্ত তেজস্ক্রিয় পরমাণুর প-শোষকের পক্ষেও বরফ অতি উত্তম। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেল, মেরুর বরফস্তর ফি বছরে অন্ততঃ দশ হাজার বার পর্যায়ক্রমিক রঙ্গায়িত হয়। যার ফলে বিশাল পরিমান বরফ সমুদ্রে ধেয়ে আসে। গ্রীন-হাউস এফেকট্''—এর জন্যও বরফ-গলার বিপদ আছে, আর াছে বিশাল জায়গার প্রয়োজন। শক্তি বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, 000 সালের মধ্যে আমেরিকার সমস্ত রি-অ্যাক্টরের তেজস্ক্রিয় অবশেষকে ষার-নির্বাসনে পাঠাতে কয়েক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থানের প্রয়োজন। র পরে তুষার-স্থানান্তর প্রস্তাবনার আশাবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। াবর্জনার তেজস্ক্রিয়তা প্রশমনের অন্যতম তাত্ত্বিক উপায় নিউট্রন-আবিষ্ট বভাজন অথবা নিউট্রন-অধিগ্রহনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের অ-তেজ-স্ক্রিয় নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন। পরিবেশগত, সামাজিকও অর্থনৈতিক অনিশ্চিতির ন্য এই পদ্ধতি আদৌ কোন দিন ব্যবসায়িক ভাবে সফল ও স্বীকৃত হবে লে মনে হয় না।

আমেরিকার আনবিক শক্তি কমিশন (A E C) এ যাবৎ তেজস্ক্রিয় বশেষ স্থানান্তরের সমস্যাকে সমাধানের যে সব পন্থা অবলম্বন করে সেছে, তাতে মনোভাব এইরকম—এখনকার মত এই ''অস্থায়ী'' পদ্ধতি লুক। আরো ভালো ''স্থায়ী'' পদ্ধতি ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তিরিশ ছর পার হয়ে গেছে। তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অনির্দিষ্ট পরিমানে প্রতিদিন বড়েই চলেছে। কিন্তু সেই ''স্থায়ী'' পদ্ধতির ভবিষ্যত আজো আসেনি। President's Council of Environmental Quality-র সদস্য জ, গুভস্ত স্পেথর স্পেনের তেজস্ক্রিয় আবর্জনার স্থানান্তরের এ যাবৎ ইতি-হাসকে বলেছেন, "history of unbroken failure to produce and acceptable method of waste disposal." আণবিক শক্তি কমিশনের প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ক্যারল উইলসন স্বয়ং সম্প্রতি (1979) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ''যেহেতু তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সম্বন্ধে গবেষণায় কোন তাৎক্ষণিক গ্ল্যামার নেই, তাই কেমিস্ট এবং কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়াররা এ ব্যাপারে উৎসাহী নন। আনবিক শক্তি কমিশনও সমস্যাটিকে অবহেলা করে এসেছে।'' উইলসনের বক্তব্য এ গবেষণায় ব্যবসায়ীরও লাভ নেই। আবার স্কলারের ভবিষ্যৎ নেই। অধুনা গৃহীত কার্যসূচী যা নেওয়া হচ্ছে, তা আগের তুলনায় প্রযুক্তিগতভাবে কিছু উন্নত হলেও, মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অনির্দিষ্ট পরিমাণে প্রতিদিন বেড়েই চলেছে

তেজস্ক্রিয় অবশেষের আকাশস্পর্শী সমস্যার সমাধানের প্রসঙ্গে বলতে হয় যে সমাধান সংক্রান্ত কার্যসূচীকে অবশ্যই প্রযুক্তিগত দিক থেকে সম্ভব, রাজনীতিগত দিক থেকে বাধামুক্ত এবং সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই মুহূর্তের কারিগরী জ্ঞান ও সামাজিক-রাজনীতিক প্রেক্ষাপটকে উপজীব্য করে দৃঢ় আস্থাপূর্ণ কোন সমাধানের নির্দেশ দেওয়া প্রগল্‌ভতার সমতুল। তবু মনে হয় ভূগর্ভস্থ স্থানান্তরের (geologic disposal) পদ্ধতি সব-চেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ এবং এ নিয়ে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন আছে। তেজস্ক্রিয়তা ধারকের তাত্ত্বিক পরিকল্পনা এবং রূপায়নের কাজকে ধাপে ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আবর্জনা-সংরক্ষণের সঠিক স্থান নির্বাচনের পরে খনিগর্ভস্থ ভল্টে কম পরিমানে ব্যবহৃত জ্বালানীর অবশেষ নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ফলাফল পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। সেই প্রাথমিক পরীক্ষা সাফল্যযুক্ত হলে তবেই চূড়ান্ত স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এবং প্রতিটি স্তরেই এই প্রাথমিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনের প্রয়োজন আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাজনীতিক আর্থনীতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য, শুধুমাত্র তেজস্ক্রিয় অবশেষের ব্যবস্থাপনার জন্যই পৃথক ও স্বাধীন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। এরপর আছে সার্বিক জনসাধারণের অবগতি, সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণের প্রশ্ন। তেজস্ক্রিয় আবর্জনা স্থানান্তরের সমস্যাটিকে এতাবৎকাল প্রশাসনিক ও কারিগরী উভয় বিভাগই অবহেলা করে এসেছেন, ক্রমাগত অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষও তাই আজ সন্দিগ্ধ, বিশ্বাসহীন। কারিগরী, পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তের প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে জনমতকে গুরুত্ব না দিলে এই গবেষণার অন্তসারশূন্যতাই প্রমানিত হবে।

স্ট্যাচু অব্ লিবার্টির নিশ্চিন্তে দিন যাপনের সময় আর নেই ।

সরকারী হিসেব অনুযায়ী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় 17000 সংখ্যক তেজস্ক্রিয় অবশেষের আধার অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত বা পোঁথিত রয়েছে । এই সংখ্যা প্রতিবছরে 4000 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ শতাব্দীর শেষে এই অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আধারের সংখ্যা দাঁড়াবে তিন লক্ষের কাছাকাছি । স্ট্যাচু অব লিবার্টির নিশ্চিন্তে দিন যাপনের সময় আর নেই ॥

হিরোশিমা দিবসের নেপথ্যে

অভিজিৎ লাহিড়ী

গণবিজ্ঞান আন্দোলন, পিপ্‌লস সায়েন্স, এই জাতীয় কথাগুলো গত বছর দুয়েক ধ'রে অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছিল । বছর দুয়েক কেন, তারও অনেক আগে থেকে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারণা চালু ছিল— পশ্চিম বাংলায় কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি কিছু কাজকর্মে'রও চেষ্টা করে আসছিল। কেরলের 'শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ' দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচিত হচ্ছিল মুখে মুখে । গত বছর দুয়েকের ভিতর যেটা দেখা গেল তা হচ্ছে, বেশ কিছু বিজ্ঞান ক্লাব আর অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠন ব্যাপারটা নিয়ে কোন না কোন ভাবে কাজে নেমে পড়তে চাইছে । বিজ্ঞান ক্লাবগুলো আগে মূলত মডেল তৈরী আর মডেলের প্রতিযোগিতা নিয়েই ব্যস্ত থাকত—এখন দেখা গেল তাদের কেউ কেউ চার পাশের মানুষের সাথে মিলে বিজ্ঞান চেতনা তৈরী, বিজ্ঞানের অপব্যবহার রোধ, মানুষের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন এই সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম করতে চাইছে । বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর ভিতর অগ্রণী গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁ ইনস্টিটিউটের (নাম থেকে বোঝা যায় এদের উদ্দেশ্য শুধু বিজ্ঞান নয়, সার্বিক সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন) কাজে এদিকে একটা ঝোঁক অনেক দিন থেকে ছিল । তবে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর পিছনে কোন একটা স্পষ্ট সামাজিক চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গী বেশী থাকে না । পূর্বাঞ্চলের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে নিয়ে 'ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন'— সংক্ষেপে E I S C A —নামে যে সংগঠনটা গড়ে উঠলো তাতে তাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকল না । অবশ্য গণবিজ্ঞানের কথা যারা বলছিল তাদেরও যে স্পষ্ট কিছু চিন্তা বা কর্মসূচী ছিল তা নয় (এখনও নেই । তবে ভাবনাচিন্তা কাজকর্মের চেহারায় কোথায় যেন একটা তফাৎ থেকে যাচ্ছিল E I S C A বা বঙ্গীয় বিজ্ঞান ক্লাবের ছেলেদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের সামাজিক রাজনীতিক দিকটার উপর আরেকটু জোর দিতে চাইছে তারা, যদিও আবা[র] রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে স্পষ্ট একটা সীমারেখাও থাকুক এটাও তাদে[র] ইচ্ছে । এদিকে আবার গণবিজ্ঞান আন্দোলনকেই মুখ্য উপজীব্য করে কা[জ] করতে চাইছিল বেশ কয়েকটা সংগঠন ও গ্রুপ । পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্[থা], পিপ্‌লস সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন, উৎস মানুষ পত্রিকা, আই-আই-[টি] খড়গপুরের সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ, এইসব সংগঠনের কাজের ধরণ আলাদ[া] আলাদা হলেও এদের ভিতর একটা পরিচিতি আর যোগাযোগ গড়ে উঠছি[ল] বছর দুয়েক ধরে । এছাড়া ইস্ট ক্যালকাটা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশ[ন] সংক্ষেপে E C S C O, কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, বজব[জ] প্রগতি সংস্কৃতি সমন্বয়, বেলেঘাটার আগামী সংস্কৃতি, এই সংগঠনগুলো তাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের উপর জোর দিতে চাই[ছি]ছিল কিছুদিন যাবৎ । গত বছর খানেক—বছর দুয়েকের ভিতর বেশ কয়েক[টা] বিজ্ঞান পদযাত্রা বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এই সব বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্ল[াব] গ্রুপ আর সংগঠন কাছাকাছি আসার, পরস্পরকে জানার সুযোগ পেয়েছিল । নদীয়ার কল্যাণী-হরিণঘাটা অঞ্চলের একটা গ্রুপের উদ্যোগ প্রকাশিত মনী[ন্দ্র] নারায়ণ মজুমদারের 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন' পুস্তিকায় দেখা গে[ল] খুব আবছা হলেও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটা সম্ভাব্য রূপরেখা ।

বিরাশির গোড়ার দিক থেকে কয়েকটা সংগঠন আর গ্রুপ আলোচন[ায়] বসতে থাকল গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটা যোগাযোগ বা সমন্বয় কে[ন্দ্র] বানানো যায় কি না স্থির করতে । মাস দুয়েকের ভেতর একটা নতুন ঘ[টনা] ঘটল—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আগ্রহ দেখাল এই প্রচেষ্টায় অংশীদার হ[তে] রাজী হল গোয়াবাগানের 'সত্যেন্দ্র ভবনের' হলঘরকে আলোচনার 'ভেন[্যু']

করতে। এখনো EISCA আসে নি এই প্রচেষ্টার ভিতর। সত্যেন্দ্র ভবনে তিন চারটে মিটিং-এও কিন্তু স্থির হ'ল না, ঠিক কি ভাবে কাজ করবে সমন্বয় কেন্দ্র। বোঝা গেল গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারণা স্পষ্ট নেই কারুর ভিতরই। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাব এল 'হিরোসিমা দিবস' পালনের।

প্রস্তাবটা আসার সাথে সাথে আমরা সকলেই বুঝলাম যে, চেষ্টাচরিত্র করলে এটাকে একটা মোটামুটি ব্যাপক কর্মসূচীর রূপ দেওয়া যাবে। এবং এর মাধ্যমে 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' কে-(এই নামটাই তখন চালু হয়ে গেছে) একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার দিকেও আমরা এগোতে পারব। তাই 6 থেকে 9 আগস্ট 'হিরোসিমা দিবস' তথা পরমাণু অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী ঠিক হ'ল। কথাটা বেশ ভালরকম চালুও হল মুখে মুখে। হাজার পনের লিফলেট ছাপিয়ে প্রচার শুরু হ'ল। প্রথম দিকে যারা ছিল, তারা ছাড়া আর বেশ কিছু সংগঠন আর গ্রুপ আসতে শুরু করল। কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের ছেলেরা জানালো, EISCA ও ভাবছে 6ই আগস্ট উপলক্ষ্যে একটা প্রোগ্রাম নেবে। আহ্বান জানানো হ'ল EISCA কে একসঙ্গে মিলে প্রোগ্রাম করতে। কাজ এগুতে থাকল ভাল ভাবেই।

তবে কয়েকটা ব্যাপারে যে বেসুর বাজে নি তা নয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গণবিজ্ঞানের (গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র সংক্ষেপে হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু 'গণবিজ্ঞান') ভিতর থেকেও যেন অন্য সবার উপরে, এরকম একটা মনোভাব গ্রহণ করেছিল প্রথম থেকেই। সত্যেন্দ্র ভবনের হল ব্যবহার করতে দিচ্ছে, টাইপ চিঠিপত্র পাঠানো, সাইক্লোস্টাইলের সুবিধা দিচ্ছে, প্রোগ্রামের টাকার একটা বড় অংশ দিচ্ছে—বিজ্ঞান পরিষদের কাছ থেকে এই সব সুবিধা পাচ্ছে গণবিজ্ঞান, সুতরাং বিজ্ঞান পরিষদের এ মনোভাব 'স্বাভাবিক' বলেই মেনে নিয়েছিল অন্যরা। তারপর যখন EISCA এল, তখন আবার দেখা দিল অন্য সমস্যা। ওরা যৌথ প্রোগ্রামে আসবে কি না, এলে কিভাবে আসবে, এসব নিয়ে ওরাও অনেক দিন ধরে পাকাপাকি কিছু বলছিল না, আবার গণবিজ্ঞানের কাজকর্মও ওদের আশায় আটকে রাখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত প্রায় একটা ভুল বোঝাবুঝির মতই অবস্থা সৃষ্টি হ'ল। দেখা গেল বিজ্ঞান ক্লাবগুলো কার ছত্রছায়ায় থাকবে এ নিয়ে বিভিন্ন সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে বিভিন্ন জনের মনে। যাই হোক, সাময়িক ভাবে সমস্যাগুলোকে চাপা দিয়ে যৌথ প্রোগ্রামে সামিল হ'ল সবাই। EISCA বেশ নমনীয় মনোভাব দেখাল। ইতিমধ্যে সর্বোদয়ের পক্ষে গান্ধী স্কীম ফাউণ্ডেসানও ইচ্ছা প্রকাশ করছে প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার। ঠিক হ'ল, প্রচারে বলা হবে গণবিজ্ঞানের সঙ্গে EISCA আর সর্বোদয় সহযোগী সংগঠন হিসাবে আছে। বিভিন্ন সংগঠনকে বলা হ'ল পোস্টার বানাতে, নাটক আর গান তৈরী করতে। কেন্দ্রীয়ভাবে পোস্টার তৈরীর ভার নিল যাদবপুর সায়েন্স ক্লাব। মেডিকাল কলেজের ছেলেরা তাড়াতাড়ি একজিবিসনের জন্য অনেক পোস্টার বানিয়ে দিলো। কাঁচরাপাড়ার 'পথসেনা' গোষ্ঠী দায়িত্ব নিল পথনাটিকার। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আর পিপলস সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন ঠিক করল তারা তথ্য ভিত্তিক এক পুস্তিকা প্রকাশ করবে হিরোসিমা দিবস উপলক্ষ্যে।

পাঁচমিশালি ব্যাপারে যে ধরণের অসুবিধা হয় তা এখানেও ছিল। মূল প্রোগ্রামের যে বিষয়, অর্থাৎ পরমাণু অস্ত্র বিরোধিতা, তার চাইতে নিজের নিজের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বাড়ানোর চিন্তার যেন প্রাধান্য ছিল অনেকের ভিতর। বিজ্ঞান পরিষদ যেমন স্পষ্ট বলেই নিয়েছিল যে, ওদের ভূমিকার একটা বিশেষ স্বীকৃতি থাকতে হবে, অন্য কেউ সেরকম না বললেও নিজের নিজের সংগঠনের কথা মাথায় রেখেছিল অনেকেই। পারিস্থিতি বিবেচনায় এটাকেও আমরা মেনে নিয়েছিলাম 'স্বাভাবিক' বলে। তাছাড়া প্রয়োজনও ছিল এর। কারণ সংগঠনগুলো ঠিকমত দাঁড়ালে তবে ত' সমন্বয়ের প্রশ্ন। কিন্তু সমস্যা হল, এক এক সংগঠন ও ব্যক্তির এক এক চিন্তা। কেউ বলছে গান্ধীর পথই সত্যিকারের শান্তির পথ—মিছিলে ফলাও করে পোস্টার তৈরী করে নিয়ে এসেছে সেই মর্মে—কেউ বা আবার তাতে অসন্তুষ্ট। কোনো গোষ্ঠী আবার মিছিলে এসে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছে—'রুশ ভারত চুক্তি ছিঁড়ে ফেল পুড়িয়ে ফেল'—যখন তাদের বলা হয়েছে যে, মিছিলটা মৌন মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উদ্যোক্তারা, অথবা রুশ ভারত চুক্তি মিছিলের বিষয়বস্তু নয়, তখন স্পষ্টই ক্ষুব্ধ হয়েছে তারা।

পরমাণু অস্ত্র বিরোধিতার ব্যাপারেও ঠিক কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিরোধিতা করা হবে, তা নিয়ে ছিল নানারকম মতামতের আণ্ডারকারেণ্ট। কেউ চাইছে বৃহৎ শক্তিগুলোর অর্থাৎ রাশিয়া আর আমেরিকার কাজকর্মের উপরই প্রধানত বক্তব্য রাখা হোক, কোন না কোনভাবে সাম্রাজ্যবাদের কথা এনে ফেলা হোক প্রচারে। কেউ আবার ভাবছে শুধু বৃহৎ শক্তি নয়, যেখানেই পরমাণু অস্ত্র সেখানেই বিরোধিতা, এইভাবে রাখা হোক বক্তব্য। এই বক্তব্যে আবার আরেক গোষ্ঠীর বেশ একটু আপত্তি, কারণ তারা মনে করে 'সাম্রাজ্যবাদ' পরমাণু অস্ত্রের মাধ্যমে যে ব্ল্যাকমেইল আর আধিপত্য চালাচ্ছে, তা রুখতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকতেই পারে। পরমাণু অস্ত্র বিরোধিতা যেন 'বুর্জোয়া শান্তিবাদ' বা প্যাসিফিজমে পরিণত না হয়, সে ব্যাপারেও উদগ্র সংশয় অনেকের মনে। তারা চাইছে কোন না কোনভাবে এই আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের একটা অংশ, এইভাবে দেখতে বা দেখাতে। অন্যদিকে আবার পরমাণু অস্ত্রের সঙ্গে রিয়্যাক্টর প্রকল্পগুলোকে

কতটা বিরোধিতার আওতায় আনা হবে তা নিয়ে ছিল মতভেদ। কারুর ধারণা শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহারকে আমাদের সমর্থন জানানো উচিত, আর কেউ কেউ বলছে শান্তির নামে যে সমস্ত প্রকল্প, সেগুলো আসলে পরমাণু অস্ত্র প্রসারেই ইন্ধন যোগায়; তাছাড়া সেগুলো থেকে লাভের চাইতে বিপদই বেশী। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যেতে পারত, পরমাণু অস্ত্র, রিয়্যাক্টর, দেশ-বিদেশের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, এসবের ব্যাপারে হালফিল খবরাখবর ও খুঁটনাটি জেনে নিয়ে, তার ভিত্তিতে একটা অবস্থান গ্রহণ করার চেয়ে, কোন একটা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বক্তব্য ও প্রচারের মোড় ঘোরানোয় আগ্রহী অংশগ্রহণকারী অনেক গোষ্ঠী।

যাইহোক, অনেক রকম মতামত থাকলেও মতভেদ কখনো প্রকট হয়ে উঠে নি। মতভেদের দরুণ প্রোগ্রামটা যাতে বানচাল না হয়, এ ব্যাপারে সচেতন ছিল সবাই। তাই শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম হল—6 তারিখে কেন্দ্রীয় মিছিল আর তারপর থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রোগ্রাম। মিছিলে লোক হ'ল এক হাজারের কিছু বেশী। আজকের দিনের কলকাতার পক্ষে এ জাতীয় ব্যাপারে বেশ বড় মিছিলই বলতে হবে। বোঝা গেল, চেষ্টা করলে গণবিজ্ঞানের একটা ভাল ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে। পরমাণু অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনেরও একটা ভাল নজীর তৈরী হল। বিদেশে খুবই জোরদার এ আন্দোলন, কিন্তু এদেশে নানা কারণে অত্যন্ত অপরিণত। এদেশে পরিস্থিতির বিচারে এবারকার প্রোগ্রামে আশান্বিত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় এটা কিছুই নয়। ভবিষ্যতে কতটা কি করা যাবে না যাবে, তা সবটাই নির্ভর করছে,-কতটা ব্যাপক ভিত্তিতে কতটা সংহত লক্ষ্যে গণবিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে উঠছে তার ওপর ॥

হিরোশিমা স্মরণে প্রতিবাদের গণকণ্ঠ

কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশ

6 আগস্ট 1945 হিরোশিমা.....

6 আগস্ট 1982 কোলকাতা .....

'হিরোশিমা দিবস'—কোলকাতার রাস্তায় বেরোলো একটা মিছিল। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র-এর ডাকে নানা প্রান্ত থেকে জমায়েত প্রায় 1200 মানুষ, যার মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুর মুখ ভেসে উঠলো।

যাত্রা শুরু হলো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের সামনে থেকে। হাতে হাতে অজস্র পোস্টার, বুকে ব্যাজ। পোস্টারের ভাষা ছিলো—'পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করো', 'মজুত অস্ত্র ধ্বংস করো', 'শান্তির জন্য পরমাণু মানে যুদ্ধের জন্য পরমাণু'। এরকম আরো অনেক।

ব্যানার সমেত ছিল 29-টা সংগঠন। শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠলো মিছিল। ভেসে এলো যুদ্ধবিরোধী গান। নিউক্লিয়ার অস্ত্রবিরোধী বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে এসেছিলেন শরিকরা।

প্রচণ্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মিছিল এগোলো শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়, বিধান সরণী, কলেজ স্ট্রীট, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হয়ে শহীদ মিনার-এর দিকে। মাঝপথে এসে পেঁছিলো পুস্তিকা—'না হিরোশিমা নাগাসাকি চাই না'। বিক্রি শুরু করে দিলো স্বেচ্ছাসেবকরা। ব্যাপক ভাবে বিলি হলো লিফ্‌লেট। অন্যান্য সংগঠন বিলি করলো তাদের লিফলেট। শ্যামলী খাস্তগীর-রা বিলি করলেন 'ফিজিশিয়ান্‌স্‌ ফর সোশ্যাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি'র লিফলেট।

শহীদ মিনার-এ শেষ হলো মিছিলের পথচলা।

গণ-জমায়েতে বক্তব্য রাখলেন জয়ন্ত বসু, সৌমেন গুহ, মৃগেন গাঁতাইত, সুকুমার গুপ্ত, দীপক দাঁ। সর্বোদয়ের পক্ষ থেকেও রাখা হলো বক্তব্য।

হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, তার বীভৎস প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মুক্তমঞ্চ নাটক 'পিক-দন' নিয়ে সামনে এলো 'পথসেনা গোষ্ঠী'। সবশেষে শোনানো হলো গান—বাঁচতে চাওয়ার গান।

শেএ হোলো হিরোশিমা দিবসের মিছিল। শুরু হলো নতুন এক অধ্যায়। দুনিয়াজোড়া নিউক্লিয়ার বিরোধী গণকণ্ঠের মিছিলে শরিক হোলো আমাদের কণ্ঠস্বর, আমাদের প্রতিবাদের ভাষা, আমাদের বাঁচতে চাওয়ার আশা ॥

কোচবিহার জেলায় হিরোশিমা নাগাসাকি ধিক্কার দিবস

কোচবিহার জেলার মহকুমা ভিত্তিক পাঁচটি বিজ্ঞান ক্লাব (কোচবিহার বিজ্ঞান ক্লাব, তুফানগঞ্জ বিজ্ঞান ক্লাব, দিনহাটার আলফা ইটা রিসার্চ এণ্ড কালচারাল ইন্‌স্টিটিউট, মাথাভাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব এবং মেখলিগঞ্জের হলদিবাড়ী বিজ্ঞান ক্লাব) 6 আগস্ট থেকে 9 আগস্ট হিরোশিমা-নাগাসাকি ধিক্কার দিবস উপলক্ষে, গত 4 আগস্ট থেকে 9 আগস্ট পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্র তথা যুদ্ধ এবং তেজস্ক্রিয় দূষণের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র সহ আলোচনা-চক্র, পথসভা, মিছিলও সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে গোটা জেলাতেই এক ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায়।

উক্ত বিজ্ঞান ক্লাবগুলির সমন্বয়ে গঠিত জেলা কমিটি প্রচার পত্রটি প্রকাশ করেন, এবং বিভিন্ন ক্লাব সমূহ নিজ নিজ মহকুমায় ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার পত্রটি বিতরণ করেন। 8 আগস্ট, জেলার মহকুমাগুলির বিভিন্ন জনবহুল অঞ্চলে বিজ্ঞান ক্লাবগুলি পথ-সভার আয়োজন করেন, বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলিতে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয় 4 আগস্ট থেকে 7 আগস্ট, এবং মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় 9 আগস্ট। মাথাভাঙ্গায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় 7 আগস্ট। কোচবিহার বিজ্ঞান ক্লাব এবং হলদিবাড়ী বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত মিছিলে লোক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় 2000 এবং 1500 জন। ডঃ মনোতোষ দাসগুপ্ত, শ্রীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরজত বর্মন ও শ্রীঅমূল্য মিত্র (কোচবিহার), শ্রীধীরেন চন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্ত পাল, শ্রীসলিল পঞ্চানন ও শ্রীনিতীশ দেবনাথ (তুফানগঞ্জ), শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী (মাথাভাঙ্গা) এবং শ্রীঅশোক রায় প্রধান (হলদিবাড়ী) প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন আলোচনাচক্র, পথসভা ও সমাবেশে পরমাণু অস্ত্র তথা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন।

আন্দুলে 'হিরোশিমা দিবস'

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র আয়োজিত "হিরোশিমা দিবস" উপলক্ষ্যে কোটনিশ মেমোরিয়াল কমিটি (আন্দুল শাখা) গত 8 আগস্ট, রবিবার সন্ধ্যায় একটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ডঃ রণজিত ঘোষের প্রারম্ভিক ভাষণের পর গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পার্থসারথি বিশ্বনাথ ও সত্যব্রত কর আলোচনার মাধ্যমে আজকের দুনিয়ার বিপুল রণসজ্জা ও তার নিরিখে 'হিরোশিমা দিবস' পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান এবং একটি হৃদয়গ্রাহী প্রতীকি অনুষ্ঠানে হিরোশিমার সেই ভয়ংকর দিনটিতে একটি ছোট্টছেলের অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানটি আঞ্চলিক মানুষের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছে।

কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবারের হিরোশিমা স্মরণ

5 এবং 7 আগস্ট আঞ্চলিক প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণী)-দের কাছে বিজ্ঞান দরবারের প্রতিনিধিরা এই দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন।

8 আগস্ট বিকেল 4-টায় স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সচেতন জনগনকে নিয়ে পরমাণু অস্ত্র বর্জন ও শান্তির দাবীতে সোচ্চার এক মিছিল কাঁচড়াপাড়ার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে কাঁচড়াপাড়া হাইস্কুলে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন সংস্থার পক্ষে বনানী বসাক, স্বপনকুমার শীল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখার্জী ও স্থানীয় পৌরপ্রধান শ্রীঅমূল্য উকিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে পরমাণু বোমার আবিস্কার, প্রয়োগ ও পরিণতির কথা তুলে ধরে শ্রী মুখার্জী এ প্রসঙ্গে—সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিকতার উল্লেখ করেন।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ অবলম্বনে স্থানীয় নাট্যসংস্থা "পথসেনা" কর্তৃক অনবদ্য একটি পথনাটিকা "পিকাদন"।

এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় স্বপনকুমার শীল লিখিত "পরিবেশ দূষণ ঃ সমস্যার সমাধান সম্ভব" শীর্ষক একটি পুস্তিকা।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই দিনগুলোর অসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরে ও পরমাণু অস্ত্র বর্জনের দাবীতে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে 9 আগস্ট বিকেলে বাগমোড় ও কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে দুটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বিশ্বে বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলোর আর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর তার ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন স্বপন শীল, অসীম ভট্টাচার্য্য, নমিতা রায়, উজ্জ্বল রায়, সুকুমার রায়, বিশ্বজিৎ মুখার্জী।

দুর্গাপুরে ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির অনুষ্ঠান

14 আগস্ট 1982, দুর্গাপুরে হিরোশিমা ধিক্কার দিবস কেন্দ্র করে কিছু

কর্মসূচী নেন ডাঃ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটির দুর্গাপুর শাখা। বিকেল চারটের সময় হয় প্রান্তিকায় জমায়েত ও পথসভা। ওখান থেকে মিছিল করে আশীষ মার্কেট। এখানে করা হয় পথসভা। এরপর মিছিল এগোয় অশোক এভিনিউ, রামমোহন এভিনিউ হয়ে দুর্গাপুর ডাঃ কোটনিস স্মৃতি-রক্ষা কমিটির অফিস অভিমুখে। সন্ধ্যে সাতটার সময় অফিসের সামনে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বক্তব্য রাখা হয়, গান পরিবেশন করা হয়, স্লাইড শো হয়, দেখানো হয় চলচ্চিত্র।

তাঁদের লিফলেটে বলা হয়—পৃথিবীর জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একমাত্র পথ। গড়ে তুলতে হবে দীর্ঘসংগ্রাম দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ।

হিরোশিমা দিবস—খড়্গপুরে

খড়্গপুর সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ-এর উদ্যোগে 15 আগস্ট রাস্তায় নামে মিছিল। অংশ নেয় মূলতঃ স্কুল শিক্ষক, স্কুলের ছাত্র এবং খড়্গপুর আই, আই, টি-র ছাত্ররা। মিছিলের শরিক ছিলো প্রায় 400 জন।

নিউক্লিয়ার বিপদ সম্পর্কে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষকরা এবং আই, আই, টি-র ছাত্ররা। এছাড়া, আয়োজন করা হয়েছিলো একটা পোস্টার প্রদর্শনীর।

স্টুডেন্টস টেক্সটবুক লাইব্রেরীর হিরোশিমা দিবস

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার স্টুডেন্টস টেক্সটবুক লাইব্রেরী (2/80 গান্ধী কলোনী, কোলকাতা 40)।

6 আগস্ট কেন্দ্রীয় মিছিলে যোগ দেয় এই সংগঠন। এরপর 15 আগস্ট স্থানীয় অভিযাত্রী ক্লাবের প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় আলোচনা চক্রের। স্থানীয় সমস্ত বিদ্যালয় ও নেতাজীনগর কলেজে এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রচার চালানো হয়। চালানো হয় স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। করা হয় সাহায্য সংগ্রহ।

15 আগস্ট লাইব্রেরীর সদস্যদের তৈরী করা পোস্টারের প্রদর্শনীর আয়োজন ছিলো। যুদ্ধবিরোধী গান গেয়ে শোনায় লাইব্রেরীর সদস্যরা এবং সারথি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

লাইব্রেরীর তরফে বক্তব্য রাখেন অসীম মজুমদার এবং গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের তরফে ডঃ কুমারেশ মিত্র। শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় 200-র মতো।

আঞ্চলিক অনুষ্ঠান

29 জুলাই '82	পঃ বঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় —কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগ।
5 আগস্ট '82	পঃ বঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।
7 আগস্ট '82	* চুঁচুড়া সায়েন্স ক্লাব / বক্তা ঃ অভিজিৎ লাহিড়ী। * সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ, খড়্গপুর।
8 আগস্ট '82	* ডঃ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি, আন্দুল শাখা বক্তা ঃ সত্যব্রত কর ও পার্থ দেবনাথ। * লোকবিজ্ঞান কেন্দ্র, হরিণঘাটা / বক্তা ঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। * সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র, লোকবিজ্ঞান শাখা, বজবজ / বক্তা ঃ ডঃ রতন মোহন খান। * বিজ্ঞান দরবার, কাঁচড়াপাড়া। * সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ, খড়্গপুর।
9 আগস্ট '82	বিজ্ঞান দরবার, কাঁচড়াপাড়া।
11 আগস্ট '82	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব ও ছাত্র সংসদ।
12 আগস্ট '82	কল্যাণী বিজ্ঞান সংস্থা, কল্যাণী।
13 আগস্ট '82	* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ক্লাব ও ছাত্র সংসদ। * ইস্পাত ক্লাব, কোলকাতা / বক্তা ঃ শিবপ্রসাদ ঘোষ।
14 আগস্ট '82	* টেক্সটবুক লাইব্রেরী, গান্ধীনগর, যাদবপুর বক্তা ঃ কুমারেশ মিত্র। * ডঃ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর।
18 আগস্ট '82	মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, কোলকাতা বক্তা ঃ সুজন সেন; অভিজিৎ লাহিড়ী।
22 আগস্ট '82	ব্যারাকপুর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, / বক্তা ঃ প্রবীর মিত্র সত্যব্রত কর, রবীন মজুমদার, রবীন চক্রবর্তী।
31 আগস্ট '82	রিসার্চ স্কলার্স এ্যাসোসিয়েশন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বক্তা ঃ জয়ন্ত বসু, সমরজিৎ কর।

JACARI-র বার্ষিক সভা

গত 7 আগস্ট ইণ্ডিয়ান জুট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে পশ্চিমবঙ্গ স্বয়ংশাসিত গবেষণাগারগুলির যুক্ত আন্দোলন সমিতির (JACARI) তৃতীয় বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন হয়ে গেলো। সভাপতিমণ্ডলী ছিলেন অধ্যাপক ডি, কে, ঘোষ, অধ্যাপক জে, দত্ত ও শ্রী এস, মিশ্র। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন অধ্যাপক বিণায়ক দত্তরায়। স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ, ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার ও কর্মচারীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এই জ্যাকারীর গত বছরের বিশদ কাজকর্মের বিবরণ তিনি তুলে ধরেন। এর সঙ্গে তিনি সংস্থার গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করার প্রস্তাব রাখেন। সভায় প্রায় 20-টি সংস্থা-সদস্য ইউনিয়নের শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন ও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীঅতীশ দাশগুপ্ত বলেন যে, সংস্থার কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এর পরিচালন সমিতির কাঠামোর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন ও জরুরী।

সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো কালাকানুনের বিরুদ্ধে এবং লেবাননে পি. এল. ও'-র সংগ্রামকে সমর্থন করে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

জ্যাকারীর প্রকাশ্য সম্মেলন হয় 11 আগস্ট সাহা ইনস্টিটিউট বক্তৃতা কক্ষে। প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র জ্যাকারীকে সর্বস্তরের কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম করতে আহ্বান করেন ॥

স্বেচ্ছাচারের শিকার—বোস ইনস্টিটিউট কর্মী

বোস ইনটিস্টিটিউটে আবার স্বৈরতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকমাস যাবৎ ওখানকার পরিচালক দমননীতি চালিয়ে সমস্ত গবেষণাগারে এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। গৎ আগস্ট মাসের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকার যেই শ্রমবিরোধ আইনের (Industrial Dispute Act, 1981) আওতা থেকে হাসপাতাল, গবেষণাগার ইত্যাদি বাদ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 6 জন স্থায়ী কর্মচারীকে বেআইনীভাবে বরখাস্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ ঐ সব কর্মচারীদের গবেষণাগারে ঢুকতে দেওয়াও বন্ধ করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার বরখাস্ত কর্মীদের বিভাগীয় প্রধানরাও এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক-গবেষকদের শতকরা 80 জনই কর্তৃপক্ষের এই পীড়ন-নণীতির সমালোচনা করেছেন এবং বরখাস্ত-আদেশ তুলে নিতে পরিচালককে অনুরোধ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, গবেষক ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত একমাত্র সংস্থা 'বোস ইনস্টিটিউট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' এই বরখাস্তের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন। সর্বস্তরের কর্মীদের সংগঠিত করে তারা আজ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে নেমেছেন। এদিকে জ্যাকারী (JACARI), পশ্চিমবঙ্গ এই আন্দোলনকে জোরদার করতে এদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উক্ত গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষের স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও অন্যান্য ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদ করছি ॥

উৎস মানুষ

॥ বিশেষ জ্যোতিষ সংখ্যা ॥

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের শেষে। জ্যোতিষ এবং অপবিজ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে বিজ্ঞান—এই বিশেষ সংখ্যায়।

দাম 3 টাকা। রেজিষ্ট্রি ডাকে 6 টাকা।

॥ যোগাযোগ ॥

সম্পাদক, উৎস মানুষ,

বি ডি 494, সল্ট লেক, কলিকাতা-64

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস এসোসিয়েশন এবং
পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সদস্য

সুনীল ভূষণ গুহের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

দুই সূর্য

প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। 1 লা জুন,1982 থেকে অগ্রিম গ্রাহক করা হচ্ছে। ডাকযোগে অগ্রিম গ্রাহক চাঁদা পাঁচ টাকা। বই পাঠানোর ডাক ব্যয় গুহ প্রকাশনী বহন করবে। হাতে বই নিলে চার টাকা।

বিঃ দ্রঃ—প্রথম কবিতার বই "এগিয়ে যাওয়ার ডাক" মাত্র বার হাজার মুদ্রিত হয়েছিল।

গুহ প্রকাশণী

গ্রাম ঃ কুসুম্বা, ডাকঘর ঃ নরেন্দ্রপুর, জেলা ঃ 24 পরগণা

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

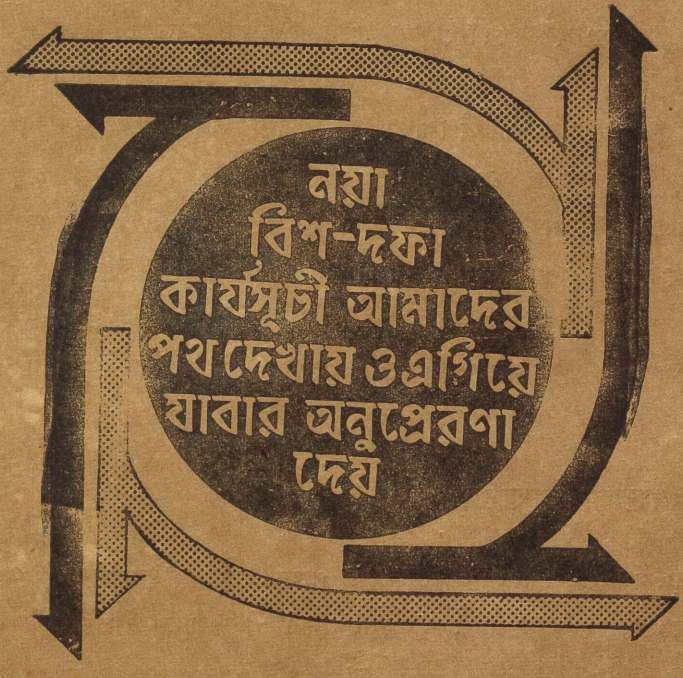

"রাষ্ট্রের কল্যাণে এই যে কর্মযজ্ঞ সেটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন্ ক্ষেত্রে কতটা জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সফল হয়ে উঠবে এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দলে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থে, আমাদের দেশের স্বার্থে, যে দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সযত্নে লালন করতে হবে, সেবা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

davp 82/20

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
c/o. ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজ
52/9C, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-12

Registration No R. N. 34929/79

Postal Regn. No. WB/CC 113

কোলকাতা 6 আগস্ট 1982, হিরোশিমা দিবসের কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশে ব্যানার সমেত অংশগ্রহণকারী সংগঠন

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, মৌসুমী গ্রুপ—বাগবাজার, ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেণ্টস্ কো-অর্ডিনেশন্ কমিটি, স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্—হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-সংসদ, ছাত্র ঐক্য কমিটি, বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, আচার্য্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ—সরশুনা, গান্ধী পীস্ ফাউণ্ডেশন্, কলিকাতা সর্বোদয় কেন্দ্র, সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, অভয় আশ্রম, ফ্যামিলি হেল্পার প্রোজেক্ট—বিরাটি, গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি), গরলগাছা সায়েন্স ক্লাব, উৎস মানুষ, কল্যাণী বিজ্ঞান সংস্থা, লোকবিজ্ঞান প্রসার সমিতি—কাশীনগর, ক্রিয়েটিভ্ কাল্চারাল্ সেণ্টার, গণফ্রণ্ট, অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্, পিপল্স্ সায়েন্স অ্যাসো-সিয়েশন্—বর্ধমান, পূর্বভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি, নর্থ হাওড়া সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, পাইওনীয়ার গ্রুপ, বিজ্ঞান দরবার—কাঁচড়াপাড়া, শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাব, মুলাজোড় সায়েণ্টিফিক্ কাল্চার সেণ্টার।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে—'উৎস মানুষ' ও 'সৃজনী'র (বর্তমানে 'মানস') যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত ; যোগাযোগ : 17B মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, কলি-17

কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমা'র মেলা ও কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়— মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 100 বসন্তবাবু রোড, কাঁচড়াপাড়া থেকে প্রকাশিত)।

মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়—উৎস মানুষ, বি. ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64 ;

গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন ? একটি প্রাথমিক খসড়া (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি-6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ;

পরিবেশ দূষণ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—স্বপন শীল (কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ;

না হিরোশিমা নাগাসাকি চাই না—সৌমেন গুহ (বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও পিপল্স্ সায়েন্স এ্যাসোশিয়েশন্) ;

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে দি লায়ন্স্ প্রেস, 143/1, শিবপুর রোড, হাওড়া-2 হইতে মুদ্রিত।